এক নজরে হজরত মুহাম্মদ সা.

অনুবাদ : রবিউল ইসলাম ও সানাউল্লাহ মন্ডল

"সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কালোর ওপর সাদারও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মানুষই আদমের সন্তান। মানুষ হিসাবে সবাই সমান।"

সমগ্র মানবজাতির জন্য সাম্যবাদিতার এই মহান বিচারধারা ঈশ্বরপ্রেরিত সর্বশেষ বার্তাবাহক হজরত মুহাম্মদ সা. এর। ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আরবের প্রসিদ্ধ শহর মক্কায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুয়ত দ্বারা ভূষিত করে অহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যমে তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে ২৩ বছর ধরে তিনি মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। তাদের নিকট ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দিলেন। সর্বশেষ নিজের মিশন সমাপ্ত করে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরকালে পাড়ি দিলেন। বর্তমান বিশ্বের ২৫ শতাংশ মানুষ নবী মুহাম্মদ স. কে নিজেদের পথপ্রদর্শক ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন। প্রতিদিন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

অবতরণের উদ্দেশ্য:

হজরত মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল 'সমাজসংস্কার'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বগণ সমাজ সংস্কারের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা থেকে এই সমাজসংস্কার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সমাজসংস্কারের রূপরেখা স্বয়ং ঈশ্বর প্রদান করেছেন। বস্তুত এতে মানুষের আস্থা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে পরিবর্তনের কঠিন কর্মভার দিয়ে মুহাম্মদ স. কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

"নিশ্চয় আমি নিজের রসুলদের স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশনা সহ প্রেরণ করেছি। আরও তাদের জন্য কিতাব ও ন্যায়দণ্ড পাঠিয়েছি, যাতে তারা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।" (কুরআন ৫৭:২৫)

অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেতে আগত অসংগতিকে পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফের পথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টাই হল নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল।

সামাজিক করুণ অবস্থা:

নবী মুহাম্মদ সা. এর ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে হলে তদানীন্তন গোটা বিশ্বের বিশেষত আরবের অরাজকতার প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। সেই সময়ের আরব -

১. রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মতো নিজ বাহুবলে কানুন বানিয়ে ফেলত। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকতো।

২. সুদ আর দাসপ্রথার মাধ্যমে দুর্বলদের ওপর জুলুম ও অত্যাচারের পূর্ণ অধিকার করায়ত্ত করেছিল বিত্তশালী সমাজপতিরা। দাসদের সমাজে পণ্যবস্তু মনে করা হতো। তাদের কোনোপ্রকার অধিকার ছিলনা।

৩. মহিলাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো।

৪. মদ, জুয়া, ব্যভিচার, ডাকাতি ইত্যাদি ছিল স্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যপার।

৫. শিক্ষার অভাব ছিল। মানুষ প্রকৃত প্রভুর উপাসনা ছেড়ে মুর্তির পূজা করতো। প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা উপাস্য দেবদেবী ছিল।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ণব্যবস্থা সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন জাতপাতে বিভাজিত করে রেখেছিল। সমাজের নিচু জাতির লোকেরা উঁচু জাতের লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হতেন। নারীদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। সতীদাহপ্রথা তাদের বাঁচবার অধিকারই ছিনিয়ে নিয়েছিল। নমঃশুদ্রদের মত মহিলারাদেরও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ স্পর্শ পর্যন্ত করার অধিকার ছিলনা। একক ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া দেবদেবীদের উপাসনা করা হতো। পশুপাখি গাছপালা চাঁদসূর্য ইত্যাদির পূজা করা হতো।

এহেন জটিল সমস্যায় জর্জরিত মানবতাকে সঠিক দিশা দেওয়ার জন্যই ঈশ্বর নিজের দূত মুহাম্মদ সা. কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

প্রচেষ্টার সূচনা:

হজরত মুহাম্মদ সা. নিজের কাজের শুভারম্ভ করেন মানুষের নিজের হাতে গড়া দেবদেবীদের উপাসনা পরিহার করে পৃথিবীতে এক প্রকৃত প্রভু ও জন্মদাতার উপাসনার প্রতি আহ্বান জানানোর মাধ্যমে।

"হে লোকসকল! উপাসনা করো আপন প্রভুর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা সমুদয় সংকট থেকে বাঁচতে পারো।" (কুরআন ২:২১)

নবী মুহাম্মদ সা. সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজ কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। প্রকৃত সফলতা হল মানুষ নরকের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে।

হজরত মুহাম্মদ সা. জানতেন সমাজ সংস্কারের কোন উদ্যোগ ততক্ষন সফল হতে পারেনা, যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যতক্ষন না নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে জবাবদিহীর জন্য দায়ী মনে করে। তাঁর আগে পৃথিবীতে যত বার্তাবাহক এসেছিলেন তাঁরা সকলেই একই সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বিকৃত হয়ে যাওয়া সম্পর্ককে পুণর্নির্মাণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষা ঈশ্বরের প্রেরিত প্রত্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ছিল। তিনি মানুষের নিকট ঈশ্বরের বাণীগুলিকে পৌঁছে দিতে প্রচেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখতেন না।

নিজের উদ্দেশ্যের সফলতা

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সফলতার এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না যা নবী মুহাম্মদ সা. অর্জন করেছিলেন। এই কারণে ১৯৯২ সালে মার্কিন গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি হান্ড্রেড' এ বিশ্বের সর্বোচ্চ ১০০ সফল ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত মুহাম্মদ সা. এর নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি এও বলেন সমগ্র জগতে ধার্মিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতা প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদ সা.।

তিনি একদিকে যেমন মানবজীবনে সফলতার নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সমাজ সংস্কারের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেছেন, অপরদিকে তিনি এমন এক আন্দোলনের সূচনা করেন যা ধীরে ধীরে তাঁর ৬৩ বছরের জীবনকালের মধ্যেই গোটা আরবের পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করে দেয়। আজও বিশ্ববাসী যার অনুসরণ করে চলেছে। নবী সা. এর দ্বারা পেশকৃত ঈশ্বরের বার্তার মাধ্যমে আরবের মূর্তিপূজারিরা, মদিনার ইহুদিরা, রোম সাম্রাজ্যের খৃষ্টানরা, ইরানের অগ্নিপূজকরাও প্রভাবিত হয়েছিল। যে কেউ তাঁর বাণী শুনে প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। নবী সা.-এর শিক্ষার ভিত্তিতে আরবে এক নতুন সভ্যতার সূচনা হল। এমন এক সভ্যতা, যেখানে কারো উপর অত্যাচার ও জুলুমের লেশমাত্র ছিলনা। নারী-পুরুষ সমান অধিকার পেত। মানব ইতিহাসে এই প্রথম নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হল। নারীর নিরাপত্তার কোনও ভয় ছিলনা। যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ -শ্বেতাঙ্গ সকলেই ছিল সমান। যেখানে জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোনো বিভাজন সম্ভব ছিলনা। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নীতিবোধের ব্যাপকতা ছিল। যেখানে গরীবদের ওপর ছিলনা কোন শোষণ। সুদের বেড়াজাল থেকে তারা ছিল মুক্ত। কন্যা ভ্রূণহত্যার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে কোনোপ্রকার কুণ্ঠার অবকাশ ছিলনা। সংকীণ রাষ্ট্রবাদিতা নয় বরং মানবতার কল্যাণের কথা ভাবা হতো। যেখানে রুজি রুটির কোনও সমস্যা ছিলনা। শাসক যেন নিজেই সেবক। মানুষকে মানুষের দাস নয় এক ঈশ্বরের দাস মনে করা হতো।

এমন সভ্যতাকে কোনও ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। আর মুহাম্মদ স এর শিক্ষার ওপর গড়ে ওঠা এই সভ্যতাকেও সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি। আজও প্রত্যেক ব্যক্তি এহেন আদর্শের জন্য অপেক্ষমান, সেই সময়েও ছিল। এই সভ্যতা আরব সীমানা পেরিয়ে দ্রুত গতিতে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং আনুমানিক হাজার বছর পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে আদর্শ হিসাবে স্থান গ্রহণ করেছিল।

পরিবর্তনের কিছু নমুনা

১) মানুষে মানুষে সাম্য : সব মানুষ একই মাতা ও পিতার সন্তান এবং সবাই সমান। জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে কেউ ছোট বা বড়ো হয়না। হজরত মুহাম্মদ সা: কেবলমাত্র এই শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি বরং এই সাম্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। তিনি মানুষকে জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভাজনকারী সমস্ত উপাদানকে নির্মূল করে সমাজকে এমন এক বার্তা প্রদান করেন যাতে সমস্ত ভেদাভেদ সমাপ্ত হয়ে যায়। ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে সমগ্র মানবতাকে বার্তা দেন :

"হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা এক অপরকে জানতে পারো। নিশ্চয় ঈশ্বরের কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক ঈশ্বরভীরু। নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (কুরআন ৪৯:১৩)

হজরত মুহাম্মদ সা. এর নিকটবর্তী সহযোগীদের মধ্যে হজরত বিলাল রাজি. একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাবসী ছিলেন, হজরত সালমান রাজি. ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তাঁর শিক্ষার প্রভাবেই আজ থেকে ১৪৫০ বছর আগেই সমাজ থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ

আমেরিকার মত উন্নত দেশেও বিগত ১০০ বছর আগে পর্যন্ত এই দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

২) ধর্মীয় স্বাধীনতা : আমাদের সকলের স্রস্টা ঈশ্বর চান যে, সমস্ত মানুষ তাঁরই নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা (ইসলাম) কে গ্রহণ করুক। কিন্তু তিনি এর জন্য কোনো মানুষকে বাধ্য করেননি। কুরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন, "ধর্মের বিষয়ে কোনও জবরদস্তি নেই।" (কুরআন ২: ২৫৫)

হজরত মুহাম্মদ সা. তাঁর অনুসারীদের এই শিক্ষা দিয়েছেন তারা যেন অন্যান্য ধর্ম ও তাদের মহাপুরুষদেরকে সম্মান করে। – "জেনে রাখো! যে ব্যক্তি কোনও অমুসলিমের ওপর অত্যাচার করবে এবং তার অধিকার হরণ করবে বা তার ওপর সাধ্যের অতীত কোনও বিষয় চাপিয়ে দেবে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও জিনিস তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো। **হাদীস।**

নজরান থেকে মদীনায় আসা খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বনকারী প্রতিনিধিমন্ডলীকে কেবল মসজিদের মধ্যে তাদের নিজের ধর্ম অনুসারে উপাসনা করারই অনুমতি প্রদান করেননি বরং তাদের নিজের বক্তব্য পেশ করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। হজরত মুহাম্মদ সা. এর ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার প্রভাবের কারণেই বহু দেশ যুগ যুগ ধরে মুসলিম শাসকদের অধীনে থাকা সত্ত্বেও সেখানকার বাসিন্দারা পরিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি পালন করতে পারতেন।

৩) মহিলাদের অধিকার : ইসলামের পূর্বে মহিলাদেরকে সমাজে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে পরিবারের লোকেরা একে লজ্জার বিষয় বলে মনে করতো। এই লজ্জা থেকে বাঁচতে সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে তারা জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলত। হজরত মুহাম্মদ সা. এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক পন্থাকে নির্মূল করেই ক্ষান্ত হননি বরং মহিলাদের সেই সম্মান ও অধিকার প্রদান করেন যা ইতিপূর্বে তারা কখনো পায়নি। যেমন – বিবাহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, তালাকের অধিকার, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অধিকার, শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার, দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অধিকার, পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব থেকে অব্যহতি, তার ওপর মিথ্যা আরোপকারীর শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, হজরত মুহাম্মদ সা. ১৪৫০ বছর আগে মহিলাদের যে অধিকার প্রদান করেছেন তা বিভিন্ন দেশের মহিলারা মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে অর্জন করেছেন। তাই ইসলাম সম্পর্কে বহু অপপ্রচার থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের দেওয়া এইসব অধিকারে প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অধিকাংশই মহিলা।

৪) নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা: হজরত মুহাম্মদ সা. বলেন, সময়ের সাথে সাথে নৈতিকতার পরিভাষা কখনো পাল্টে যায়না। ১৪৫০ বছর আগের অনৈতিকতা এখনকার নৈতিকতা হতে পারেনা এবং নৈতিকতা রাষ্ট্র তথা দেশের ওপরও নির্ভরশীলও নয়। তিনি নৈতিকতার এমন এক সংজ্ঞা প্রদান করেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বকালের জন্য বৈধ। ইসলামে নৈতিকতার মৌলিক ভিত্তি হল যে – "এই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী, এর প্রতিপালনকারী ও এর পরিচালনকারী এক ঈশ্বর।" এই কারনে সব মানুষ তাঁর প্রজা এবং তাঁর এই জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য হল তাঁর আজ্ঞানুসারে জীবন অতিবাহিত করা। এর অতিরিক্ত কিছুই না। এমন প্রতিটি জিনিসই নৈতিক যা তিনি অনুমোদন করেছেন। অন্যদিকে যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন তাই অনৈতিক, সমগ্র বিশ্বও যদি সেই কাজে লিপ্ত হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, ভ্রষ্টাচার, ধর্ষণ, ব্যভিচার, হত্যা, সুদখোরী, বড়দের অসম্মান ইত্যাদি কাজ সর্বদাই অনৈতিক ছিল এবং থাকবে। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বড়দের শ্রদ্ধা, অপরের প্রাণ রক্ষা ইত্যাদি সর্বদাই নৈতিক বিষয় ছিল এবং আগামীতেও তেমনই থাকবে।

হজরত মুহাম্মদ সা. কেবলমাত্র নৈতিকতার সংজ্ঞাই প্রদান করেননি বরং তাকে চেনার ও পরীক্ষা করার ভিত্তিও প্রদান করেছেন। যাতে মানবজাতি পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

"সত্যের পথে চলো, কারণ এটাই সোজা রাস্তা যা স্বর্গের দিকে গিয়েছে।" হাদীস।

৫) রাজনীতিতে আদর্শের প্রতিপালন : সমাজ সংস্কারের কোনও আন্দোলন ততক্ষণ সফল হতে পারে না, যতক্ষণ না রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধিত হচ্ছে। এই কারণেই পূর্নাঙ্গ সমাজ সংস্কারের রূপরেখায় হজরত মুহাম্মদ সা. রাজনীতিকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী সা. বলেছেন, ঐশ্বরিক জীবনব্যবস্থা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথপ্রদর্শন করে, তা আর্থিক ক্ষেত্র হোক বা রাজনৈতিক। তিনি আরও বলেন, মানুষ কখনো নিরপেক্ষ হয়ে আইন তৈরী করতে পারেনা। এটা কেবলমাত্র মানবজাতির স্রস্টা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিরপেক্ষ এবং মানুষের প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত। মানবজাতির জন্য কিসে লাভ এবং ক্ষতি কিসে, একমাত্র তিনিই এই সঠিক জ্ঞান রাখেন। নিজেরা আইন তৈরী করার পরিবর্তে ঐশ্বরিক আইনের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তিনি কেবলমাত্র একথাই বলেননি যে, বাস্তবে শাসক প্রজাদের সেবক বরং এই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন অতিবাহিত করেন।

নবী সা. অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। মাটিতে ঘুমাতেন, সাদা-মাটা খাদ্য খেয়ে থাকতেন। তাঁর কাপড়ে তালি লাগানো থাকতো এবং তাঁর বাড়িতে আড়ম্বরতার কোনও সামগ্রী থাকতো না। বহুবার এমন হয়েছে অভাবের কারণে তাঁর গৃহে কয়েক দিন যাবৎ রান্না হতোনা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরাও এই আদর্শ পালন করতেন। একবার এক রাষ্ট্রদূত ইসলামী শাসক ওমর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তাঁকে মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পান।

বার্তাবাহক হজরত মুহাম্মদ সা. এর উপদেশ

“যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে নরকে যাবে।”

“যদি তুমি মাতা-পিতার সেবা করো, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো, তাদের আদেশ পালন করো তাহলে স্বর্গে যাবে। তাদেরকে কষ্ট দাও, তাদের মনে দুঃখ দাও, তাদের পরিত্যাগ করো তাহলে নরকের পাত্র হবে।”

“ঈশ্বরের অবাধ্যতার কাজে কারো (তা পিতামাতার পক্ষ থেকেই হোকনা কেন) আদেশ পালন নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য।”

“তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে।”

“অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও জালিম শাসকের বিরুদ্ধে উচিত কথা বলা, সত্যের আওয়াজ তোলা সবচেয়ে বড় ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ)।”

“নিজের অধীনস্তদের নিকট হতে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ো না।”

“সুদ খাওয়া এমন নিকৃষ্ট পাপ যেন তা নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার সমান।”

“অন্যের সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করো, যেমন ব্যবহার তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো।”